CBCS B.A. HONS -POLITICAL SCIENCE

SEM-VI : CC-14T: Indian Political Thought-II
TOPIC: VIII. Iqbal: Community
ইকবাল: সম্প্রদায় ধারণা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

---

ভূমিকা:

স্যার মুহাম্মদ ইকবাল, আল্লামা ইকবাল নামে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষের মুসলিম কবি, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদ,শিক্ষবিদ ও ব্যারিস্টার ছিলেন।তার ফার্সি ও উর্দু কবিতা আধুনিক যুগের ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।তাকে পাকিস্তানের আধ্যাতিক জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ইকবাল তার ধর্মীয় ও ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের জন্যও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন।

ইকবালের জন্ম ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের (বর্তমানে পাকিস্তান) শিয়ালকোটের একটি জাতিগত কাশ্মীরি পরিবারে। তাঁর পরিবার হলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সাপ্রু যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইকবালের বাবা শেখ নূর মুহাম্মদ ছিলেন দর্জি, আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত নন এবং জীবন যাপনে ছিলেন ইসলামের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত-প্রাণ। স্কটিশ মিশন কলেজেই ইকবাল সর্বপ্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ সালে স্কটিশ মিশন কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ইকবাল লাহোরের সরকারি কলেজে ভর্তি হন দর্শন, ইংরেজি ও আরবি সাহিত্য নিয়ে এবং এখান থেকে তিনি স্বর্ণ পদক নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে যখন তিনি মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন ততদিনে তিনি সাহিত্য অঙ্গনে পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

ইকবাল ভারতীয়, পাকিস্তানি, বাংলাদেশী, ইরানিয়ান এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি হিসাবে প্রশংসিত। তিনি "আধুনিক সময়ের মুসলিম দার্শনিক চিন্তাবিদ" হিসাবেও অত্যন্ত প্রশংসিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আসরার-ই-খুদী ১৯১৫ সালে পারস্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর বিখ্যাত উর্দু রচনাগুলি হল বাং -ই -দারা ,বাল -ই -জিবরাইল এবং আরমাঘান -ই -হিজাজ । ১৯২২ সালের নিউ ইয়ার্স অনার্সে তাকে রাজা পঞ্চম জর্জ তাকে নাইট ব্যাচেলর এ ভূষিত হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়া ও উর্দু-ভাষী বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলে ইকবালকে শায়র-ই-মাশরিক' হিসাবে বিবেচনা করা হয়।তাকে মুফাক্কির-ই-পাকিস্তান (পাকিস্তানের চিন্তাবিদ), মুসোয়াওয়ার-ই-পাকিস্তান ('পাকিস্তানের শিল্পী") ইত্যাদি নামে ডাকা হয়।

অচিরেই ইকবাল দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি ভাবিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর চিন্তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে। তিনি অনেক বেশি ইসলাম প্রবর্তিত দর্শন আঁকড়ে ধরেন, তাঁর

লেখালেখির মধ্যেও পরিবর্তন আসতে থাকে। ১৯১০-এ ইকবাল আলিগড়ে গিয়ে ভাষণ দিয়ে এলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে লেখালেখির মধ্য দিয়ে ইকবাল তার নিজস্ব বিশ্বাস প্রচার করেন যার ভিত্তি হল ইসলামের সর্বব্যাপী সম্পূর্ণতা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যে ইসলামের সংগ্রামী ভূমিকাতে আস্থা রাখা। তিনি ইসলামচর্চার মধ্য দিয়ে একটি বিশুদ্ধ বোধ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এই বিশুদ্ধ ইসলাম তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন পয়গম্বরের সমকালে ও পরবর্তী সময়ের চারজন খলিফার আদর্শ শাসনকালে। ইকবাল মনে করতেন যে ইসলাম ধর্মের মধ্যে একটি ক্রুটিহীন সামগ্রিক দর্শন নিহিত আছে, এই ধর্ম মানুযের অধ্যাত্ম জীবনের ও বস্তু জীবনের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছু সংকীর্ণ ও গোঁড়া ভাবনা ও ব্যাখ্যাকে তিনি অস্বীকার করেন।

প্রথমদিকে ইকবালের কবিতা ছিলো গীতিধর্মী, তার রচনার বিষয়বস্তু ছিল ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাসহ নাগরিক জীবনের যন্ত্রণার নানাবিধ অনুভব। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ধর্ম ও তার প্রতীকী প্রকাশের নানা দিক তুলে ধরেন। তার রচনাতে এক রকমের ম্রিয়মাণ নিরাশ, অসুখী সুর প্রতিধ্বনিত হয় এবং বাস্তবে ভারতের মুসলমান সমাজ এই সব হতাশার অসুখে ডুবে ছিল। ইকবালের একান্ত ইচ্ছা ছিল নিষ্ক্রিয় গতিবিহীন মুসলমান সমাজকে কর্মমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা ও মানসিক বলে বলীয়ান করে তোলা।

আসলে ইকবাল নিন্দাসূচক অর্থে তার স্বীয় সমাজের দুরবস্থা তুলে ধরেন। অন্যদিকে জওয়াব-ই-শিকওয়া'তে ইকবাল এই দুরবস্থার কারণ হিসেবে মুসলিমদের আত্মবিচ্যুতি, সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যদের অনুকরণ ও নিজস্বতা পরিহারকে দায়ী করেছেন। আসলে ইকবাল ইউরো প থেকে ফিরে এসে মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রত্যয় ও সংকট থেকে পরিত্রাণকেই লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরেন ফলে তার কাছে ইসলামের বিকাশ ও ব্যাপ্তি প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যে কারণে তিনি রচনা করলেন 'তরানা-এ মিল্লী'। যার প্রথম দুটি লাইনেই তিনি বৃহত্তর ইসলাম (Pan-Islamism)-এর ভাবনা তুলে ধরেন।

তার কাব্যগুলি মুসলিম জনমানসের হৃদয়ে নাড়া দেয়। এই সময় কিছু প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মধ্যে আমরা ইকবালের ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতি ও কাঠামো নিয়ে যে জানতে পারি। ১৯০৯ সালে ইকবাল ইসলাম ধর্মের মূল প্রকৃতি প্রবন্ধ লেখেন তাতে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম নিয়ে একটা তুলনামূলক সমীক্ষা উপস্থিত করে তিনি প্রমাণ করতে চান যে একমাত্র ইসলাম ধর্ম সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে তুলে ধরে। ইকবাল তার যুক্তি নির্মাণ করেন এইভাবে যে, সব ধর্মই বিশ্বজগৎ ও মানব প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু পূর্বানুমান তৈরি করে। এই রকম একটি মনস্তাত্ত্বিক অনুমিতি হল যে আধিপত্য বিস্তারকারী উপাদানটি হল যন্ত্রণাময় বেদনার্ত অনুভূতি। একক ব্যক্তি হিসেবে মানুষ যন্ত্রণার অনুভূতির কাছে অসহায়; ব্যক্তি

আত্মরক্ষায় অসমর্থ কারণ সে দুর্বল। ধর্মের লক্ষ্য হল ব্যক্তির দুর্বলতা তথা ভীতিকে দূর করে তাকে আত্মশক্তিতে ভরপুর করে তোলা। এমন ভাবে ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হবে যে সে সমস্ত ধরনের ভীতি থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হবে।

ইসলামের দৃঢ় ও একনিষ্ঠ সমর্থক ইকবাল। তিনি মনে করতেন ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয় তার থেকেও অধিক তাৎপর্য আছে। তাই এর সঠিক ও স্থির উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। সঠিক উপলব্ধিই ইসলাম সম্পর্কে সম্যক্ ও যথার্থ ধারণা দিতে পারে। তিনি মনে করতেন জীবন সামনের দিকে গতিশীল একটি প্রবাহ। এই প্রবাহ পথে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক সদস্যের অবশ্য কর্তব্য। আসলে ইকবালের দর্শন কর্মবিমুখ ছিল না বরং তা হল কর্মকাণ্ডের দর্শন তথা গতিময় জীবনের দর্শন। যার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে আমিত্ববোধের (ego)বিকাশ ঘটানো। প্রকৃতপক্ষে ইকবালের দর্শন জন্ম নিয়েছিল তার সমকালীন আধুনিক সময়ের প্রয়োজন তথা আলিগড় আন্দোলন ভাবনাকে পুষ্ট করতে। ইকবাল তাঁর রচনাবলির মধ্য দিয়ে নিজের বিশ্বাস ও ইসলামের সর্বব্যাপী সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতার বাণী প্রচার করতে থাকেন। তাঁর দর্শনে আধ্যাত্মিক যুক্তিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তার ভাবনাকে অনেকে Iqbalian Philosophy তথা ইকবালের দর্শন নামে চিহ্নিত করেন যা ১৯৩০'র দশকে ভারতের মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ইকবাল বিশুদ্ধ ইসলাম চর্চার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক তথা সমস্ত ধরনের সমস্যার সমাধানের সন্ধান করে থাকেন। ইকবালের দার্শনিক বোধ তাঁর জীবনপথের নানা লেখায় পাওয়া যায়। আমিত্ববোধ (Self/ego)এবং আত্মসচেতনতাই হল ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের মূল। যে যত আত্মসচেতন সে তত সচেতন চিন্তনের অধিকারী সত্তা। যতই সে চিন্তা করবে ততই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মহৎগুণ ধারণ করে ঐশ্বরিক ভাবনায় বিলীন হতে পারে তখন জাগতিক ভয় তাকে আর আঘাত করবে না। ব্যক্তি ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তিকে নিজের মধ্যে অনুভব করবেন। এই হল ইকবালের ঈশ্বরকেন্দ্রিক মানবতার দর্শন তথা

'Humanism with God'। ইকবালের বাসনা ছিল গতিশীল নিশ্চল মুসলমান সমাজকে মানসিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে সচল ও শক্তিশালী করা। তিনি তাঁর সহজাত প্রবণতা থেকে কোনো আন্দোলনের ডাক দেননি তবে আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব কিংবা খিলাফত ভাবনা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি—একথা বলা যায়। ইকবাল একদা বলেছিলেন, ইসলাম ধর্মের একটা উদ্দীপনার বীজ সুপ্তভাবে আছে। সেই বিশাল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি এ সত্য উপলব্ধি করেন যে, কবিকে একটি স্বপ্ন দৃশ্য তৈরি করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। শুধু নিজে স্বপ্ন দেখা নয়, কবির দায়িত্ব অন্যকে স্বপ্ন দেখানো। ইকবাল উপলব্ধি করেন যে, একটি জাগতিক জনপ্রিয় মতাদর্শরূপে ইসলামের জনপ্রিয়তার অবনমন ঘটেছে। তাই এর পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে তিনি ইসলামের বিশ্ববীক্ষা ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনা তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধি এই দুটি বিষয়ের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু মহম্মদ ইকবাল ছিলেন এ বিষয়ে গান্ধিজির-ই

পূর্বসূরি যিনি এরকম একটি সংবেদনশীল ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছিলেন। ইকবাল ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি ভাগে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যথা-প্রথমত, ভারতে ইসলাম ধর্মের সূচনার সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়কে সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রথমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা এবং পরে আধিপত্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। ফলে মুসলমান সমাজ এই সময় যথেষ্ট সাহসী ও শৌর্যের অধিকারী ছিল। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী স্তরে ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষ করে প্রবর শ্রেণি অনেক বেশি বিলাসব্যসনে মগ্ন হয়ে পড়ে, ফলে আমুদে আহার-বিহার প্রিয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে পড়ে। ফলে উদার মিশুকে শ্রেণির মুসলমান তৈরি হয় যারা দেশ শাসনের জন্য যে স্নায়ুচাপ ও রেষারেষির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সেই চাপ মুক্ত হয়ে তারা জীবনকে উপভােগ করতে শুরু করে। তৃতীয়ত, শেষের দিকে মুসলিম শাসক ও সম্প্রদায়গণ কিছুটা আত্মসংবৃত ও অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে কারণ এই সম্প্রদায়ের মানুষজন এটা বুঝতে পারে যে সঠিকভাবে রাজ্য পরিচালনার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন এবং তারা সেই চেষ্টা করতে থাকে।

ইকবাল ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে তার তত্ত্বকে বাস্তবের নিরিখে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। তিনি যেভাবে এক ভাষার সমতা, অভিন্ন দেশ, অর্থনৈতিক স্বার্থের একীকরণকে জাতিগঠনের একমাত্র কিংবা অনিবার্য উপাদান নয় বলে মনে করতেন তাতে তার মধ্যেকার ধর্মীয় মানসিকতার তথা ধর্মীয় মতাদর্শের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আসলে ইকবাল ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে উপলব্ধি ও বক্তব্য পেশ করেন তাতে মনে হয় তিনি চেয়েছিলেন ইসলাম ধর্মকে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে পুনর্জাগরিত ও গতিশীল করে তুলে ভারত-ইতিহাস প্রবাহকে মুসলমানদের পক্ষে সুবিধাজনক করে তুলতে। ইকবালের মতের পরিবর্তন শুধু মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করে চালিত হওয়ায় তার জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনাতেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সারে জাঁহা সে আচ্ছা'র কবির জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার দিক ও পরিবর্তন প্রবাহকে আমরা দেখতে পারি।

ইকবাল মনে করতেন তার চিন্তা সমকালের ব্যক্তিগণ সেভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। আসলে ইসলামীয় মতাদর্শ ও ভাবকে কেন্দ্র করে তার দার্শনিক প্রত্যয় ব্যক্তি অধিকার ও রাষ্ট্রীয় ন্যায়কে অনেকাংশে ইসলামের সঙ্গে সংযুক্ত করে তুলছে ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি ইসলামকে স্বমহিমায় তুলে ধরতে ও ইসলামিক আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। ইকবাল লিখেছিলেন, "I have given the best part of My life to a careful study of Islam, its law and polity, its culture, its history and its citizen." | ইকবাল নিজেকে একজন রাজনীতিবিদ ভাবতেন না। জীবনের প্রথমদিকে তিনি রাজনীতি সচেতন কবিতা লিখলেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি বরং যে ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান নেই তাকে তিনি অসম্পূর্ণ মনে করতেন। তবে পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণ দেখা যায়। তার এই পরিবর্তনই

তাঁকে ভবিষ্যতে ভিন্ন ধারার জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার আশ্রয়দাতা ও পরিচর্যাকারী হিসেবে তুলে ধরে। ইকবালের জাতীয়তাবাদ যদিও পশ্চিমি দেশে থাকাকালে নতুন রূপ পায় ।।

তত্ত্বগতভাবেই ইকবাল জাতীয়তাবাদকে অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক বলে মনে করতেন। কারণ, জাতীয়তাবাদ শুধু যে যুদ্ধ ও দ্বন্দু জন্ম দেয় তাই নয়, আধ্যাত্মিকতার বিচারেও জাতীয়তাবাদ অসম্পূর্ণ। জাতীয়তাবাদ পুরাতন ঔপনিবেশিক মানসিকতার আধুনিক প্রকাশ মাত্র। জন্মস্থান অনুযায়ী মানুষকে বিচার করার অর্থ মানুষের অবমূল্যায়ন। ইকবালের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ভাবনার পরিবর্তন ঘটে ইউরোপে বাসকালে। যিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক বা স্বাদেশিকতার কবি, তিনিই পরিণত হলেন মিল্লাত বা ইসলামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কবিতে। আসলে ইউরোপের কর্মোদ্যোগ যেমন ইকবালকে প্রভাবিত করে ঠিক তেমনি সীমানাকেন্দ্রিক জাতীয়তার ভাবনা তাকে বিচলিত করে এবং সেই ভাবনা তুলে ধরেন তার লেখনীতে।

ইকবাল তার লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজের যে পরিচিতি তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাতে আপাতদৃষ্টিতে তাকে অনেকে তির্যক চোখে দেখেন। আদপে তিনি বৃহত্তর অর্থে আপেক্ষিকতাকে সামনে এনে তার জন্ম সম্প্রদায়ের মুক্তি ও বৃহত্তর অর্থে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেন। তাকে কখনোই ভারত বিরোধী বলে চিহ্নিত করা যায় না। বরং তার চিন্তার মধ্যে সমকালীন সময়ের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে তাকে কল্পলোকবাসী মনে করেন। তার চিন্তায় ব্যক্তির সামগ্রিক স্থান নেই। তবে ভারতের সামগ্রিক স্বার্থ তার মাথায় ছিল এবং লেখনীতেও তা প্রকাশিত হয়েছে। একজন দার্শনিক ও কবি ইকবাল তার চেতনাশ্রিত বোধগুলিকে নিজের মতো সাজিয়েছেন।

অন্যদিকে সৈয়দ মজুফফর হুসেন বারনি লিখেছেন, “ভারতের দাসত্ব বন্ধন তীব্র বেদনা দিয়েছে ইকবালকে। দেশকে প্রথম তিনি দেখতে চেয়েছেন স্বাধীন, তারপর চেয়েছেন প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করে ভারত তার নিজের অতীত গৌরব পুনরায় চিনে নিক। মহত্ত্বের নিহিত সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে এই সত্য উপলব্ধি করে তারপর সে তার মনীষা ও দর্শনের ঐশ্বর্যের বলে চালিত করুক জগৎকে। তিনি চেয়েছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসারহীন রোশনি, যাতে তার চিত্ত মোহগ্রস্ত হয়েছে তার সম্বন্ধে সাবধান হোক ভারতীয়রা। ইকবালকে নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। তবে এককথায় তার চিন্তা ও চেতনাকে সামনে রেখে বলা যায় তিনি হলেন একজন উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও কবি।